بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৩ আষাঢ় ১৪১৯
০৭ জুলাই ২০১২

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও **'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১২'** উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল জেলে, মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান ও গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের আপামর জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের মৎস্য সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে সমন্বিত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং আধুনিক উপায়ে পরিকল্পিত মৎস্যচাষ, আহরণ ও ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বিবেচনায় রেখে এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ **'রুপালি মৎস্য দিচ্ছে ডাক, দরিদ্রতা ঘুচে যাক'** শ্লোগান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাবনাময় এ খাতের কাঙ্খিত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে নতুন উদ্যম ও প্রেরণা নিয়ে কাজ করতে হবে।

আমি **'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১২'** এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

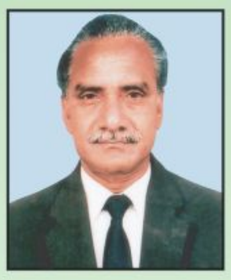

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

২৩ আষাঢ় ১৪১৯
০৭ জুলাই ২০১২

বাণী

নদীমাতৃক বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাত অসামান্য অবদান রাখছে। কাজেই জাতীয় স্বার্থে এ খাতের উন্নয়নে সকলের সার্বিক অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিসহ জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনের প্রভাবে সারা বিশ্বেই কৃষি খাত হুমকির মুখে রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি খাত এবং মৎস্য উপখাতও এ হুমকির বাইরে নয়। এ চ্যালেঞ্জ দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মৎস্য খাতের উন্নয়নের গতিধারাকে আরো সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টায় ব্যাপক জনসচেতনতা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রতি বছরের ন্যায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় মৎস্য অদিদপ্তর এবারও **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১২** উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে।

এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে **রুপালি মৎস্য দিচ্ছে ডাক, দরিদ্রতা ঘুচে যাক**। এ উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলে দেশের রুপালি মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের মাধমে দারিদ্র্য নিরসন এবং দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। আমি সহনশীল মৎস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১২** এর সকল প্রয়াসের সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস,এমপি

মৎস্য খাতে বিগত তিন বছরে অর্জন ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

ভূমিকা

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রায় ৬০% আমিষের যোগান দেয় মাছ। এ দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি'র ৪.৪৩ শতাংশ এবং মোট কৃষিজ আয়ের ২২.২১ শতাংশ মৎস্য খাত হতে আসে। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৫৬ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। দেশের রপ্তানি আয়ের ২.৭৩ শতাংশ আসে মৎস্য উপখাত হতে।

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও নির্বাচনী ইস্তেহারে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় মৎস্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মৎস্য সেক্টরে অর্জিত হয়েছে বিশেষ সাফল্য। বিগত তিন বছরে মৎস্য সেক্টরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান: মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিগত ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ২৫.৬৩ লক্ষ মে.টন। বর্তমান সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম এবং চাহিদামাফিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে ২০১০-১১ অর্থবছরে এ উৎপাদন ৩০.৬২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। বিগত তিন বছরে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.১১ শতাংশ। চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন ৩২.২২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।

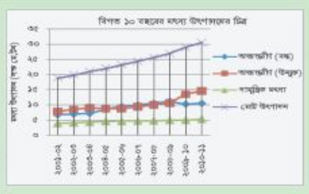

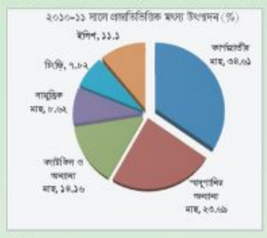

দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও জেলেদের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে দেশের প্রায় ১০.৫ শতাংশ বা ১৫৬ লক্ষ লোক তাঁদের জীবন-জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য উপখাতের ওপর নির্ভরশীল। মৎস্য সেক্টর সংশ্লিষ্ট এ জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৩ লক্ষ নারী, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক শতাংশ। এছাড়াও উল্লিখিত সময়ে অর্থাৎ বিগত তিন বছরে এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অতিরিক্ত বার্ষিক প্রায় ৬ লক্ষাধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৮-০৯ সালে কাপ্তাই লেকে মাছের উৎপাদন ছিল প্রায় ৫৪৯৪ মে.টন। বর্তমান সরকার বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা এবং বিএফডিসির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ফলে ২০১১-১২ সালে লেকে মাছের উৎপাদন প্রায় ৮৪২২ মে.টনে উন্নীত হয়েছে এবং এক সময়ের অলাভজনক প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়েছে।

২. পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম ও বিল নার্সারি স্থাপন: বিগত তিন বছরে প্রায় ৫১৬ মে.টন পোনামাছ উন্মুক্ত জলাশয়ে অবমুক্ত করা হয় এবং এর ফলে প্রায় ১৫ হাজার মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হয়েছে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের সময়েই মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় দেশে প্রথমবারের মত বিল নার্সারি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয় এবং গত তিন বছরে প্রায় ২৯২টি বিল নার্সারি পরিচালনা করা হয়। এ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে বার্ষিক গড়ে প্রায় ২,০০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হয়েছে এবং জলমহালের ওপর নির্ভরশীল জেলে বা সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি: আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ। ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল হচ্ছে জাটকা সংরক্ষণ এবং মা ইলিশ রক্ষা। এ লক্ষ্যে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশের নিরাপদ প্রজননের জন্য প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগের পাঁচ দিন ও পরের পাঁচ দিন (মোট ১১ দিন) উপকূলীয় এলাকাসহ দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ করে মৎস্য আইন ২০১১ সালে সংশোধন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৫টি জেলার মোট ৮৫টি উপজেলায় ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১,৮৬,২৬৪টি ইলিশ জেলে পরিবারের মধ্যে মোট ১৪.৪৭ হাজার মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। তারই ক্রমধারায় ২০১১-১২ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত) ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় একই এলাকা ও সমসংখ্যক ইলিশ জেলে পরিবারে ৩০ কেজি হারে চার মাসের জন্য মোট ২২.৩৫ হাজার মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়।

৪. পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ: চিংড়ি বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষও উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এ সমস্ত চিংড়ি খামারের উৎপাদন ২০০১-০২ সালে ০.৯৮ লক্ষ মে.টন হলেও ১০ বছরের ব্যবধানে ২০১০-১১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১.৮৫ লক্ষ মে.টনে দাঁড়িয়েছে। রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মধ্যে প্রায় ৫৭ শতাংশ চিংড়ি। জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। আশা করা যায়, এ নীতিমালা মোতাবক পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে চিংড়ি খামার থেকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি একটি স্থায়িত্বশীল চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন সম্ভব হবে। নানবিধ অপপ্রচার ও নেতিবাচক কার্যক্রমকে মোকাবেলা করে এ ক্রমবর্ধনশীল শিল্পকে অধিক স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি-বেসরকারি সকল সুফলভোগীদের নিয়ে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। চিংড়ি খাতে গবেষনা জোরদার করার জন্য বাগেরহাটে একটি চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ১৫ মার্চ ২০১১ তারিখে উদ্বোধন করেন।

৫. সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন: অভ্যন্তরীণ জলসম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যেই জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী/জেলেদের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। দেশের সকল জলমহালে এ ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে সমাজভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জলাশয় সংশ্লিষ্ট জেলেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জলাশয়ের জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে প্রায় ৫০০টি অভয়াশ্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের তিন বছরে ২৬০ টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি যথা- চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংরা, মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে।

৬. মৎস্য আইন বাস্তবায়ন: মৎস্য উপ-খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদি উদ্যোগকে সামনে নিয়ে বর্তমান সরকার কর্তৃক মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১১ প্রণয়ন করেছে। পাশাপাশি মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এবং মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১ ইতোমধ্যেই প্রণীত হয়েছে। দি প্রটেকশন এন্ড কনজার্ভেশন অব ফিস রুলস ১৯৮৫ সংশোধন করে ৪টির স্থলে ৫টি এলাকায় ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণাএবং ইলিশের ভরা প্রজনন মৌসুমের কাল সংশোধন করা হয়েছে।

৭. মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র প্রদান: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগে বর্তমান সরকার কৃষকদের মত দেশের প্রকৃত জেলেদের শনাক্ত করে নিবন্ধকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য গত মার্চ ২০১২ মাসে ৮৪.৫২ কোটি টাকা ব্যয়েএকটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকৃত জেলেদের জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সরকারি প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান সহজতর হবে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে (ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি) জীবননাশ ঘটলে জেলে পরিবারকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে।

৮. বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ নিবিড়করণ: দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যেই রুই জাতীয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাস, কৈ, শিং, মাগুর ও তেলাপিয়া উৎপাদনের এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। আগামী ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন ৪.০ মে.টনে উন্নীত করে মাছের চাহিদা পূরণে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সব পুকুর-দীঘি লাগসই মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে এ ক্ষেত্রে মাছের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫.০ থেকে ৬.০ টনে উন্নীত করা সম্ভব।

৯. মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন: বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, বরোপিট, হাওর-বাঁওড় ও নদী-নালায় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ সকল জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে উন্নয়ন করে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১১-১২ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন সাতটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী মোট ৯৭০টি জলাশয়ে মাছের আবাসস্থল (আয়তন প্রায় ২১২৩ হে.) উন্নয়ন করা হয়েছে। এ সকল জলাশয় উন্নয়নের ফলে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৩,০০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়।এছাড়া একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি বাঁওড়ের (দৈর্ঘ্য ৯.৩ কি.মি.) আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই মধুমতি বাঁওড়ের ৪৫০ হেক্টর জলাশয় ড্রেজিং-এর মাধ্যমে খনন করা হয়েছে। আগামীতে অন্যান্য জলাশয় উন্নয়নসহ হুরা সাগর মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে হুরা সাগর নদীর প্রায় ৬০ হেক্টর পুনঃখননের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

১০. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন মূলত আহরণ নির্ভর। উপকূলব্যাপী ৭১০ কিমি দীর্ঘ তটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের বিশাল সুযোগ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদের ন্যায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৎস্যজীবীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অতি সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১.১১ লক্ষ বর্গ কিমি এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত ও সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এ সম্পদ প্রত্যক্ষ জরিপের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য ফিসিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ, মৎস্যসম্পদের প্রজাতিভিত্তিক মজুদ নিরূপণ এবং সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণমাত্রা নির্ণয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে চলমান বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয় করে সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণের নিমিত্ত পেলাজিক, ডিমারসেল এবং ল্যান্ডবেইজ্‌ড জরিপ পরিচালনা করার লক্ষ্যে একটি গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প হতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত স্যাটেলাইট প্রযুক্তি নির্ভর Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান সরকারেরসময়ে দেশের উপকূলীয় জেলেদের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে জীবণ রক্ষাকারী সামগ্রী ও মাছ ধরার সরঞ্জামসহ ২৫টি ফাইবার বোট বিতরণ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় দেশের উপকূলীয় এলাকায় আরও ১৮৫টি ফাইবার বোট বিতরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসব আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব নৌকার বিভিন্ন সুবিধা বিবেচনা করে পরবর্তীতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় জেলেদের মাঝে আরও অধিক সংখ্যায় নৌকা সরবরাহ করা হবে। এছাড়া আইইউইউ ফিসিং-এর ক্ষেত্রেও মৎস্য অধিদপ্তর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে আইউইউ ক্যাচ সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে মাছ রপ্তানি করা হচ্ছে।

১১. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সরবরাহ: আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত হচ্ছে তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার। এছাড়াও ঢাকার সাভারে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি অত্যাধুনিক রেফারেন্স ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। মাছ ও চিংড়ির মাননিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান কার্যক্রমের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালের মার্চ মাসে ইইউ মিশন-এর সুপারিশে মৎস্য পণ্য রপ্তানিতে আরোপিত ২০% বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করার বিধান অতি সম্প্রতি প্রত্যাহার করা হয়েছে।যদিও প্রতিবেশী অন্যান্য দেশ হতে এখনও সে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করা হয়নি। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্ধারিত মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশন কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সেক্টরে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রায় ১.৯০ লক্ষ চিংড়ি খামার ও ৯.৬ হাজার রপ্তানিযোগ্য ফিনফিস খামার রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ২০১০-১১ অর্থবছরে ৯৬৪৬৯ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশ আয় করেছে ৪,৬০৩.৮৩ কোটি টাকা। বিগত ১০ বছরে রপ্তানি আয় বেড়েছে প্রায় তিনগুণ এবং ২০০৭-০৮ সালের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৫.৫৬%। অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সংরক্ষণ এবং বিপণনের বিষয়েও সরকার বিশেষভাবে সচেষ্ট রয়েছে। মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধের মাধ্যমে বাজারে নিরাপদ মাছ প্রাপ্তির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর প্রায় ৭৭০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যার মাধ্যমে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য বাজার ও আড়তগুলোতেসচেতনতা সভা করার পাশাপাশি মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী ও মৎস্য আড়ত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে অত্যাধুনিক ৮০টি ফরমালিন ডিটেকটিং ডিজিটাল কিট বক্স বিতরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায় এ ডিটেকটিং কিট বক্স সরবরাহ করা হবে।

১২. প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ: রুই-কাতলা জাতীয় মাছের অন্যতম প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী, লবণাক্ত ও আধা-লবণাক্ত মাছের অন্যতম চারণক্ষেত্র সুন্দরবন এবং মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ হাওর-বাঁওড় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর নিবিড় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকার প্রাকৃতিক পোনার উৎসস্থল হালদা নদীকে রক্ষায় ১,৩২১.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে ২০১২ সালে বিগত ১০বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫৬৯ কেজি রেণু আহরিত হয়েছে।

১৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন: মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকল উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ২.১৫ লক্ষ জনকে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে ও ১১২ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত তিন বছরে ৯৭টি ১ম শ্রেণীর পদে জনবল নিয়োগ করাসহ ৩য় শ্রেণীর পদে ২৩৮ জন ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে ৩৬২ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০০টি ক্ষেত্র সহকারীর (রাজস্বখাতে হস্তান্তরযোগ্য) পদ সৃষ্টির প্রস্তাবনা অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে। সর্বোপরি সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর অর্জিতব্য লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরে বিদ্যমান মোট ৪৮৪৬টি রাজস্বখাতের পদের সাথে অতিরিক্ত আরও ২৪৫৭টি পদ রাজস্বখাতে সৃজন করার প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স সম্পন্ন করার মাধ্যমে